শতাব্দীর মোহনায় সিডনি

প্রদীপ দেব

০৩

সিডনি সেন্ট্রাল স্টেশানে বাস থামলো সকাল আটটায়। এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম! বাসের সময়সূচী অনুযায়ী সকাল এগারোটায় সিডনি পৌঁছানোর কথা। আসার সময় ক্যানবেরা হয়ে আসার কথা ছিলো। কিন্তু ক্যানবেরার যাত্রী না থাকাতে মেলবোর্ন থেকে সরাসরি চলে এসেছে বাস। আমি স্বপনদাকে বলেছিলাম এগারোটায় এসে পৌঁছাবো সিডনি। এখন তিন ঘন্টা সময় পাওয়া গেলো হাতে। সময়টাকে কাজে লাগানো যাক। এগারোটার আগে কাউকে ফোন করার দরকার নেই।

আমার সাথে তেমন কোন ব্যাগেজ নেই। একটাই ব্যাকপ্যাক। বাস থেমেছে রাস্তার ওপর বাস থামার নির্দিষ্ট জায়গায়। ড্রাইভার নেমে বাসের ব্যাগেজ কেবিন খুলে একটার পর একটা ব্যাগ নামিয়ে রাখতে লাগলেন রাস্তার উপর। মনে হলো সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিজের নিজের ব্যাগ নিয়ে নিচ্ছে। যেভাবে খোলা জায়গায় ব্যাগ নামানোর ব্যবস্থা, কে কোন্ ব্যাগ নিচ্ছে দেখার কেউ নেই। যে কেউ যে কোন ব্যাগ নিয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু মনে হলো এখনো এখানে ব্যাগ হারানোর বা চুরির ঘটনা খুব একটা ঘটেনি। আমরা তো বাধ্য না হলে কোন সিস্টেম বদলাই না। আমার ব্যাকপ্যাক ড্রাইভারের হাত থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়তেই তুলে নিলাম। এবার কোন্‌দিকে? রাতের বাসি মুখটা একটু ধোয়া দরকার।

স্টেশানের বারান্দা দেখে মনে হচ্ছে বেশ পুরনো। কমপক্ষে শত বছরের পুরনো বিল্‌ডিং। কিছু পূনর্গঠনের কাজও চলছে একদিকে। খুব একটা আহ্লাদিত হয়ে ওঠার মতো সুন্দর কিছু নয় এই সেন্ট্রাল স্টেশান। পাবলিক টয়লেট ঝকঝকে পরিষ্কার। স্টেশানের প্লাটফর্মের চেয়েও বেশি পরিষ্কার টয়লেটের মেঝে। মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। এই গন্ধেও ক্লান্তি দূর হয়ে যায় অনেকখানি। স্নান করতে চাইলেও করা যায় শাওয়ার রুমে। মানুষের সবচেয়ে মৌলিক চাহিদাগুলো এখানে অবহেলিত নয়।

বাস স্টেশানের সাথেই লাগানো সিডনি সেন্ট্রাল ট্রেন স্টেশান। বাইরের দিকটা দেখে মনে হয় কয়লার ইঞ্জিনের যুগের কোন স্টেশানে ঢুকছি। কিন্তু ধারণাটা বদলে যায় একটু পরে। বিশাল স্টেশান। তবে খুব একটা সুন্দর লাগছে না আমার। ঢাকার কমলাপুর স্টেশানের স্থাপত্যের কাছে এই সিডনি স্টেশানের তুলনাই চলে না। একজন রেল কর্মচারী ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করছেন কিছু কাঠের বোর্ড বদল করে। এখনো হাতেই বদলানো হয় এখানে? হয়, তবে সেটা মনে হয় ঐতিহ্য রক্ষার্থে। অসংখ্য ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশনে ইলেক্ট্রনিক্যালি আপডেট করা হচ্ছে ট্রেনের আসা যাওয়া। এগারোটার পরে আমাকে যেতে হবে ট্রেনে। এশফিল্‌ড। আমার ঠিক ধারণা নেই কতদূরে বা কোন্ লাইনে যেতে হবে। স্বপনদা বলে

দিয়েছিলেন কীভাবে যেতে হবে। ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলাম। সময়মতো আবার দেখে নিতে হবে। উন্নত দেশে নাকি পড়তে জানলে পথ হারানো সম্ভব নয়। দেখা যাক। আপাতত শহরের মাঝখানে যাই কীভাবে। নাকি শহরের মাঝখানে আছি এখন; বুঝতে পারছি না। ইনফরমেশান সেন্টার থেকে একটা ফ্রি বুকলেট তুলে নিলাম। ট্যুরিস্টদের জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য আর রঙিন ম্যাপ চমৎকার অফসেট পেপারে ছাপানো আছে। দেয়া আছে সিডনির সিটি ম্যাপ, বাস ট্রেন আর ফেরীর সময়সূচি।

এখানের পাবলিক ট্রানসপোর্ট সিস্টেম মেলবোর্নের চেয়ে একটু ভিন্ন। মেলবোর্নের সিস্টেমের সাথে পরিচিত হয়ে গেছি বলেই হয়তো এখানে একটু অন্যরকম লাগছে। সিটি সার্কেল টিকেটের দাম নিলো দুই ডলার। ভাড়াটা বেশিই মনে হলো একটু। মেলবোর্নে কতক্ষণের জন্য টিকেট সে হিসেবে টিকেটের দাম। এখানে দূরত্ব অনুযায়ী। আবার পিক আওয়ার আর অফপিক আওয়ারের পার্থক্যও আছে। ট্রেনের নাম 'তরংগ'। এরা বলে টারাংগা। নামটা সুন্দর লাগলো আমার। বগিগুলো তিনতলা। প্লাটফরমের সমান একটা অংশ। সেখানে সিঁড়ি আছে ওপরের তলায় উঠে যাবার, বা নিচের তলায় নেমে যাবার। আমাদের মতো ঘন জনসংখ্যার দেশে এরকম ট্রেনের খুব দরকার ছিলো। অবশ্য আমরা ব্যবস্থা না থাকলেও ট্রেনের ছাদে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে নিই যখন দরকার হয়। ট্রেনের সিটগুলোও মজার। সিটের হেলান দেয়ার অংশটাকে আগে পিছে টেনে নিয়ে ইচ্ছেমতো সামনের দিকে বা পেছনের দিকে মুখ করে বসা যায়। সিটি ঘুরে দেখার ইচ্ছায় ট্রেনে ওঠা। কিন্তু সামান্য যে কয়েকটা স্টেশান পড়লো তার বেশির ভাগই মনে হলো মাটির নিচে। ফলে কিছু দেখা গেলো না, একবার মনে হলো সাগর দেখলাম আর ব্রীজ দেখলাম। ঠিক মতো দেখার আগেই দেখি আবার চলে এসেছি সেন্ট্রাল স্টেশানে। প্লাটফরমে নেমে মনে হলো আবার এখানে বের হবার কোন মানে হয় না। যতক্ষণ আমি প্লাটফরমের বাইরে চলে না যাচ্ছি ততোক্ষণ আমার টিকেট ভ্যালিড। আবার উঠে পড়লাম ট্রেনে।

কিন্তু পুরো তিন ঘন্টা একটা ট্রেনে বসে একই পথে ঘোরার কোন মানে হয়না। নেমে পড়লাম একটা স্টেশানে। স্টেশানের নাম Wynyard. আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশান। বেশ বড় আর নানা রকম আলো ঝলসিত দোকানের সারি এখানে। সিডনি শহরের মোটামুটি কেন্দ্রেই এই স্টেশান। প্লাটফরম থেকে বেরুবার মুখে মেশিনে টিকেট ঢোকাতে হয় গেট খোলার জন্য। আমার টিকেটের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলো বলে সেটা আর বেরুলো না মেশিন থেকে। ব্যাপারটা নতুন। মেলবোর্নে টিকেটের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এক্সপায়ার্ড লিখে দেয় টিকেটের গায়ে, কিন্তু টিকেট ফেরত দেয়। অবাক হবার মন না থাকলে নাকি কোন কিছু দেখে মজা পাওয়া যায় না। তাই আমি তৈরি হয়ে আছি অবাক হয়ে মজা পাবার জন্য।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে এখনো। স্টেশান থেকে বেরুতেই জর্জ স্ট্রিট। ম্যাপে দেখা যাচ্ছে সিডনি শহরের একটা প্রধান স্ট্রিট এই জর্জ স্ট্রিট। জর্জ নামে পাঁচ ছয় জন রাজা তো ছিলো বৃটেনের। তাদেরই কোন একজনের নামে হবে এই জর্জ স্ট্রিট। নাম নিয়ে সাধারণ মানুষ এখানে মাথা ঘামায় বলে মনে হলো না। চায়নিজ দেখা যাচ্ছে এখানেও প্রচুর। চোখে পড়ছে আমার মতো বাদামি চামড়ার মানুষও। সিডনিতে প্রচুর বাংলাদেশী আর ইন্ডিয়ান আছে

শুনেছি।

জর্জ স্ট্রিট ধরে হাঁটছি। কোন দিকে যাচ্ছি জানিনা। কেবল মনে রাখার চেষ্টা করছি যেন ফিরে আসতে পারি আবার ট্রেন স্টেশানের কাছে। প্রচুর লোকজন রাস্তায়। খ্রিস্টমাস চলে গেছে কয়েকদিন আগে। কিন্তু মানুষের কেনাকাটা কমেনি। এখন সামনে নিউইয়ার্স ডে। সব দোকানেই বিরাট বিরাট মূল্যহ্রাস লেখা পোস্টার। মূল্যহ্রাসের পরিমাণ যেমনই হোক, বিজ্ঞাপনের পরিমাণ কিন্তু বিশাল। সারা বছরই তো এই মূল্যহ্রাস চলে দেখেছি। সামার সেইল, উইন্টার সেইল, খ্রিস্টমাস সেইল, নিউইয়ার্স সেইল, ভ্যালেন্টাইন সেইল, আরো কত রকমের সেইল। মেলবোর্নের কার্লটনে আমার বাসার কাছে একটা দোকানে সারা বছরই একটা বিজ্ঞাপন ঝুলতে দেখি ‘‘Sale Only For Today".

মার্কেট স্ট্রিট পার হতেই দেখি সামনে সাগর। নামটাও সুন্দর; ডার্লিং হারবার। চমৎকার একটা ছোট্ট ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে একদম সাগরের কাছে। হাত বাড়ালেই পানি ছোঁয়া যায়। এখানে প্রচুর মানুষ। টিপটিপ বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আকাশ গোমড়া। বাতাসের বেগও খুব একটা কম নয়। হাতের নড়বড়ে ছাতা একবার উল্টে গেলো। এখানে কেউ আমাকে চেনেনা, তারপরও কেমন লজ্জা লাগলো উল্টানো ছাতার জন্য। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম কেউ আমাকে দেখছে কিনা। অনাবশ্যক অনুসন্ধান। প্রচুর ট্যুরিস্ট এখানে। হাঁটছে দলে দলে। কেউ কেউ ছোট ছোট লঞ্চ টাইপের ফেরীতে উঠছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে।

একটু এগিয়ে গেলেই সিডনি একোয়ারিয়াম। এই একোয়ারিয়াম নাকি বিখ্যাত। সিডনিতে এসেও এই একোয়ারিয়াম দেখে না গেলে বিরাট সুযোগ হারানোর অবস্থা হবে। হাতে সময় আছে প্রায় দুঘন্টা। লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। বিরাট লম্বা লাইন। ছেলেমেয়েদের ভীড় দেখে বোঝা যাচ্ছে ছুটির সময়টাকে কাজে লাগাচ্ছে তারা। প্রাপ্ত বয়স্কদের টিকেটের দাম সাড়ে সতেরো ডলার। স্টুডেন্টদের জন্য প্রায় চল্লিশ পারসেন্ট কনসেশান। স্টুডেন্ট কার্ড দেখানোর পরে আমাকে দিতে হলো দশ ডলার। হাতের ওপর রাবার স্টাম্পের সিল লাগিয়ে দিলো হাস্যময়ী টিকেটমাস্টার। তার নামটা সম্ভবত লিজা বা লিন্ডা; বুকের ওপর লাগানো নেমট্যাগের লেখাটা অহেতুক লজ্জার কারণে ভালো করে পড়তে পারিনি। আধখোলা বুকের দিকে তাকাতে বুক ধড়ফড় করে।

গেটের মুখেই প্রথমে যা চোখে পড়ে তা হলো কোডাক ফিল্মের দোকান। এদের ব্যবসায়িক বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। জানে এখানে মানুষ ছবি ওঠাবে। ফিল্ম শেষ হয়ে যেতে পারে, ক্যামেরার ব্যাটারি শেষ হয়ে যেতে পারে, এমনকি যারা ক্যামেরা সাথে আনতে ভুলে গেছে তারাও ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারে। ক্যামেরা ভাড়া দেবার ব্যবস্থাও আছে।

আস্তে আস্তে এগোচ্ছি সামনে। মনে হচ্ছে একটা সুন্দর সাজানো গোছানো গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। নিয়ন্ত্রিত আলো; কোথাও উজ্জ্বল, কোথায় আধো অন্ধকার। জলজ প্রাণীদের প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃত্রিম ভাবে তৈরি করতে বেশ যত্ন নেয়া হয়েছে। মেঝেতে পুরু কার্পেট।

ডানে বাঁয়ে বিরাট বিরাট কাচের ঘর। মনে হচ্ছে গভীর সমুদ্রকে বেঁধে রেখেছে কাচের আবরণে। দেয়ালে দেয়ালে পানিতে ভাসমান প্রাণীগুলোর বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী। বেশ শিক্ষণীয় আর আকর্ষণীয়। সময়ের অভাবে পড়তে পারলাম না সব। লাল নীল হলুদ সব রকমের হাজার হাজার মাছ। এদেরই কিছু জাত ভাই ধনীলোকের ড্রয়িং রুমের মিনি একোয়ারিয়ামে থাকে। তাদের আবার আলাদা আলাদা বাহারী নামও থাকে। এখানে অবশ্য বৈজ্ঞানিক নাম ছাড়া আর কোন বাহারী নাম নেই।

একজায়গায় দেখা গেলো বিশাল একটা কাছিম। বেশ বড় একটা পাথরের কাছে বসে আছে। গায়ে রাজ্যের ময়লা। পাশের খোপে আছে বিশাল আকৃতির কাঁকড়া। দাঁড়া দুটোর দৈর্ঘ্য মাপলে একমিটারের বেশি হবে। কোথায় পাওয়া যায় এদের, কী বৃত্তান্ত সব লেখা আছে। ছোট ছোট টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর নানা রকম তথ্য। ধারাবিবরণী শুনতে ইচ্ছে করলে দেয়ালের হুক থেকে হেড ফোন তুলে নিয়ে কানে লাগালেই হয়। জানা হয়ে যায় অনেক কিছু। একটু সামনের দিকে এগোবার পরে দেখা গেলো বেশ বড় একটা পুকুর। ঘরের ভেতর পুকুর দেখে ভালোই লাগলো। পুকুরের মাঝখানে ছোট একটা দ্বীপের মতো আছে। সেখানে বসে আছে চারপাঁচটা সিল মাছ। কয়েকটা সাঁতার কাটছে পুকুরে। এই সিল মাছের নানা রকম শারীরিক কসরৎ দেখানো হয় দিনে কয়েকবার। এগারোটায় একটা শো আছে, কিন্তু আমি দেখতে পারবো না।

অন্যদিকে যাবার পরে দেখা গেলো একটা কুমির। খুব একটা বড় নয়, দেখলে ভক্তি বা ভয় কোনটাই জন্মে না। এই ঢেঁকির মতো অলস প্রাণীটা নাকি সুযোগ পেলে আস্ত মানুষ গিলে খেতে পারে, বিশ্বাস হয়না। চারপাশের স্টিলের বেড়া ধরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। বৈদ্যুতিক আলোঘেরা এই পরিবেশে কুমিরটাকে একদম মানাচ্ছে না এখানে। ভালো লাগলো না। আবার ছোট কাচের খোপের সারি। পেঙ্গুইন দেখা গেলো তিন চারটা। পেঙ্গুইনের ছবি দেখে তাদের যতটা ভালো লেগেছিলো আমার, এদের দেখে খুব হতাশ হলাম। এর চেয়ে ভালো সাইজের কোন পেঙ্গুইন পায়নি এরা প্রদর্শন করার জন্য! আমাদের দেশের চিড়িয়াখানার বাঘ নাকি ঠিকমতো খেতে না পেয়ে বেড়ালের মতো হয়ে যায়। এদের এখানে নিশ্চয় পেঙ্গুইনের খাদ্য কর্মচারীদের পেটে যায় না। তবে এই পেঙ্গুইনগুলো কেন ঝড়ের মুখে পড়া কাকের মতো হয়ে গেছে জানিনা। কেমন যেন ভয়ে কাঁপছে সব সময়। পেঙ্গুইনের পাশের খোপে প্লাটিপাস। হাঁসের ঠোঁটের মতো ঠোঁট এদের। আবার গায়ে পশুর মতো লোম। পাখি আর পশুর অদ্ভুত সমন্বয় এই প্রাণীটির শরীরে। এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোথাও এদের পাওয়া যায় কিনা জানিনা। ভেবেছিলাম প্লাটিপাস হলো হাঁসের মতোই নিরীহ ধরণের প্রাণী। কিন্তু তা মোটেও ঠিক নয়। প্লাটিপাসের নাকি বিষ আছে, সাপের বিষের মতোই তীব্র বিষ। সাপের ছোবলের মতোই মারাত্মক প্লাটিপাসের কামড়। তবে প্লাটিপাসের কামড়ে কেউ মারা গেছে বলে শুনিনি কখনো।

আর একধাপ নিচে নামার পরে গভীর সমুদ্রের প্রাণীর সমাবেশ। ওরে বাপ্‌স। কাচের সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে সমুদ্রের নিচে হাঁটছি। আশে পাশে মাথার ওপরে পায়ের নিচে সর্বত্র বিরাট বিরাট হাঙর ভেসে বেড়াচ্ছে। চোখ তুলে তাকালে দেখা যায় তাদের বিশাল

তেলতেলে পেট। কোন ভাবে কাচের আবরণ ভেঙে গেলে হাঙরের খাদ্য হতে হবে। বৈদ্যুতিক আলোয় সাগর তলের কৃত্রিম পরিবেশ উজ্জ্বল ভাবে দেখা যাচ্ছে। বিরাট বিরাট কচ্ছপ ভেসে বেড়াচ্ছে হাঙরের পাশাপাশি। এই কাচের ঘরে ভরপেট খাবার সহ সব ধরণের আরাম পেয়ে এদের স্বাভাবিক স্বভাব যে বদলে গেছে তা বোঝাই যাচ্ছে। সমুদ্রের আসল পরিবেশে এরা নিশ্চয় এমন অহিংস থাকে না। তাছাড়া এত ঘনবসতিও নয় সেখানে। ঈল মাছ দেখা গেলো অনেক। অনেকটা অজগর সাপের মত লাগে এদের। মাসুদরানা সিরিজের কোন একটা বইতে পড়েছিলাম ঈলের কথা। সেখানে ঈলের বর্ণনা পড়ে মনে হয়েছিলো এই মাছ একটা জীবন্ত বিভীষিকা। কিন্তু ধারণার সাথে বাস্তবের মিল দেখছিনা এখানে।

দেড়ঘন্টা সময় কীভাবে যেন কেটে গেলো। একোয়ারিয়াম থেকে বেরোবার পথ হলো একটা সুভেনির শপের ভেতর দিয়ে। নানা রকম মন কাড়া সব সুভেনিরের প্রলোভন এড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ এখন ঘষা কাচের মতো আধা উজ্জ্বল। জর্জ স্ট্রিট, মার্কেট স্ট্রিট ইত্যাদি সদ্য পরিচিত রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়ে সিটির একটা রেলওয়ে স্টেশনে ঢুকে পড়লাম।

স্বপনদাকে ফোন করলাম একটা পাবলিক ফোনবুথ থেকে। বাসায় কেউ নেই। তার মানে স্বপনদারা এখনো সিডনিতে ফেরেননি। খারাপ লাগছে খুব। স্বপনদারা সারা বছর ছুটি পাননা খুব একটা। এখন কুইন্সল্যান্ড বেড়াতে গেছেন অনেকদিন পর। কিন্তু আমার জন্য তাঁদের ভ্রমণ সংক্ষেপ করে চলে আসছেন। মানুষকে অসুবিধায় ফেলতে আমার জুড়ি নেই। স্বপনদার মোবাইলে ফোন করলাম। পাওয়া গেছে। তাঁরা আছেন সিডনি থেকে অনেক দূরে। সিডনি ফিরতে রাত ন'টা বেজে যাবে। আমাকে বললেন আমি যেন নির্মলদার বাসায় চলে যাই। যাবার আগে যেন নির্মলদাকে ফোন করি। তাহলে তিনি স্টেশন থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাসায়।

নির্মলদা স্বপনদার কাজিন। বাংলাদেশে থাকতে স্বপনদা আমার দিদির সহকর্মী ছিলেন। সে হিসেবে আমার দাদা। নির্মলদার সাথে আমার পরিচয় নেই। একদম একটা অপরিচিত মানুষের বাসায় কীভাবে ফোন করে বলবো যে আমি আসছি আপনাদের বাসায়। এধরণের পরিস্থিতি সামলানোর জন্য যে ধরণের স্মার্টনেস থাকতে হয় তা আমার কখনোই নেই। কিন্তু কী করা যাবে। আমি যেমন তাঁকে চিনিনা তিনিও তো আমাকে চেনেন না। তাছাড়া তিনিও যেমন বাংলাদেশ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে আছেন, তেমনি আমিও। এত ভাবনার কী আছে? নিজেকে বোঝালাম আমি।

Wynyard থেকে Ashfield ভাড়া দুই ডলার ষাট সেন্ট। মেলবোর্নের সাথে তুলনা এসে যায় স্বাভাবিক ভাবে। মেলবোর্নে দুই ডলার ত্রিশ সেন্ট দিয়ে ছয় বার আসা যাওয়া করা যাবে ওয়েনিয়ার্ড থেকে এশফিল্ড। মনে হলো সিডনির পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম মেলবোর্নের চেয়ে পিছিয়ে আছে। টিকেট কেটে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা। আন্ডার গ্রাউন্ড রেলওয়ে স্টেশান। প্লাটফরম ঝকঝকে পরিষ্কার। মানুষের আনাগোনা থেমে নেই। যাত্রীর ভীড় দেখে মনেই হচ্ছে না যে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার সাত ভাগের

একভাগ। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ায় সিডনিতেই জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এক একটা ট্রেন এসে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে প্লাটফরম পরিষ্কার করার যান্ত্রিক ঝাড়ু নিয়ে হাজির হচ্ছে সুইপিং ডিপার্টমেন্টের লোক।

নির্মলদার বাসায় ফোন করলাম।
- 'হ্যালো'। মিষ্টি একটা গলা ফোনের ওপ্রান্তে।
- 'হ্যালো, নির্মলদা বাসায় আছেন?'
- 'বাপি তো নেই। আপনি কি মামণির সাথে কথা বলতে পছন্দ করেন?'
ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত মেয়েটি বাংলা বলার সময় ইংরেজি থেকে সরাসরি অনুবাদ করছে বুঝতে পারছি।

নির্মলদার ছেলেমেয়ে ক'জন তো জানিনা। নির্মলদার স্ত্রীর গলা শুনে বুঝতে পারলাম মেয়ে তার গলার মিষ্টতা পেয়েছে মায়ের কাছ থেকেই। বৌদির কথা শুনে বুঝতে পারছি আমার আসার ব্যাপারটা তাঁরা জানেন। বৌদি দুঃখপ্রকাশ করছেন আমাকে নিতে স্টেশানে আসতে পারছেন না বলে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসতে আমার কোন কষ্ট হবে কিনা তিনি বারবার করে জানতে চাইলেন। কিন্তু আমার কোন কষ্টই হবে না। বরং আমার স্বস্তি লাগছে এই ভেবে যে আমার জন্য স্টেশানে এসে অহেতুক অপেক্ষা করতে হচ্ছে না কাউকে। তাছাড়া আমাকে যেহেতু চিনেন না সেহেতু বাদামী চামড়ার অপরিচিত কাউকে দেখলেই 'আমি' ভেবে বসতে পারেন। তারচেয়ে এই ভালো। বেশ খুশি মনে ট্রেনে চেপে বসলাম।

স্বপনদা আমাকে নির্মলদার বাসার ঠিকানা দিয়েছিলেন আগেই। এদেশে ঠিকানা জানা থাকলে বাড়ি খুঁজে বের করা কোন ব্যাপার না। জানালায় চোখ রেখে বসে আছি। বাইরে সবুজ প্রান্তর আর ছবির মতো সুন্দর সাজানো সব আবাসিক এলাকা। সাব-আর্বান এরিয়া। ছোট ছোট স্টেশানে ট্রেন থামলেই আমার চোখ চলে যাচ্ছে স্টেশানের নাম লেখা বোর্ডে। স্টেশানের প্রত্যেকটা লাইটপোস্টেই স্টেশানের নাম লেখা আছে। ফলে নিজের স্টপ পেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা কম। একটা ম্যাপ থাকলে সুবিধা হতো। সিডনির ট্যুরিস্ট গাইডে সাবার্ব ম্যাপ হয়তো আছে। কিন্তু ইচ্ছে করছে না ব্যাগ খুলে ম্যাপ দেখতে।

এশফিল্ড স্টেশানে নেমে একটু সমস্যায় পড়ে গেলাম। স্টেশান থেকে বেরোবার পথ হলো একটা ওভারব্রীজের ওপর দিয়ে। ব্রীজ থেকে নামার দুটি পথ চলে গেছে দুই বিপরীত দিকে। লোফ্টাস স্ট্রিটে যাবার জন্য কোন্ দিকে নামতে হবে আমাকে? কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়াটা সহজ। কিন্তু সহজ কাজও কেন যেন করতে পারিনা সহজে। ভুল পথে একটুও না হেঁটে সঠিক পথ ধরলে নাকি পথ ভুল করার সম্ভাবনা বাড়ে। কথাটা বিখ্যাত কেউ বলেছেন কিনা বা আমি নিজেই বানালাম কিনা জানিনা, তবে মনে হলো বেশ আশাব্যাঞ্জক কথা। একদিকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। কেবল মনে রাখার চেষ্টা করছি পথ ভুল হলে যেন স্টেশানে ফিরে আসতে পারি। আমার বাবা বলতেন, ''অপরিচিত জায়গায় গেলে ওখান থেকে পরিচিত জায়গায় ফিরে আসার পথটা আগে চিনে রাখবি। তাতে মনোবল কমবে না।'' এসময় এসব কথা মনে আসার অর্থ হলো আমি মিস্ করছি আমার বাংলাদেশে ফেলে

আসা দিন।

এই সাবার্বের সাথে মেলবোর্নের সাবার্বের খুব বেশি পার্থক্য নেই। সাজানো গোছানো বাড়িঘর, কিছু দোকানপাট, পার্ক। চারদিকে কেমন যেন চুপচাপ সবকিছু। শহরের কোলাহল এখানে নেই। এরা মনে হয় জোরে কথাও বলেনা এখানে। লোফ্‌টাস স্ট্রিট কোথায় কোন্‌দিকে কে জানে। ট্যাক্সি নেয়ার দরকার আছে কি? এলাকার মুদি দোকানদাররা নাকি পথঘাটের ভালো নির্দেশনা দিতে পারে। কিন্তু এখানে মুদি দোকান কোথায়? তাছাড়া নির্মলদার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে হলো। সামাজিকতায় আমি অনভ্যস্ত। কিন্তু অনভ্যস্ততাতো কোন গুণ নয়।

একটা মিল্কবার চোখে পড়লো। মেলবোর্নের অনেক মিল্কবারের মালিক চায়নিজ। এখানে এটার মালিকও চায়নিজ। এরা আছে বেশ সুখে। সুখের চেয়েও কৌশলে। ব্যবসার অলিগলি চায়নিজ আর ইহুদীদের মতো আর কোন জাতিগোষ্ঠী এত ভালো চেনে না। ছোট ব্যবসা করলে বিভিন্নভাবে লাভ এদেশে। দোকানও এটা, বাসাও এটা। ফলে বাসার সমস্ত গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির বিল যাচ্ছে ব্যবসার নামে। নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি কাগজে পত্রে দেখাচ্ছে ব্যবসার কাজে লাগছে। এখানে ব্যবসা করলে ইনকাম ট্যাক্সে অনেক ছাড় পাওয়া যায়। তাছাড়া বাড়ির সবাইকে ব্যবসার অংশীদার হিসেবে দেখিয়ে মোট আয়কে অনেক ভাগে ভাগ করে দেখানো হয় যে ইনকাম খুব কম। এভাবেও ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যায়। আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির দামও তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। মিল্কবার চালানোর জন্য কোন কর্মচারী রাখার দরকার হয়না এদের। স্বামী বাইরে কাজ করলে স্ত্রী ব্যবসা সামলায়, আর স্ত্রী বাইরে কাজ করলে স্বামী। ছোট বাচ্চা থাকলে তাদের রাখার জন্যও বেবী সিটার বা ডে কেয়ার সেন্টারের দরকার হয়না এদের। আমি দোকানে ঢুকে দেখলাম ছয় সাত বছরের এক চায়নিজ মেয়ে বসে আছে কাউন্টারে। চেয়ারটা তার তুলনায় বেশ উঁচু আর বড় দেখাচ্ছে। এই পুঁচকে মেয়েটাই দোকান চালাচ্ছে? তার মা বা বাবা ভেতরে আছে বলে আমার ধারণা। মেয়েটার চোখ আমার পিছু পিছু ঘুরছে। আর আমার চোখ ঘুরছে দোকানে যেনতেন ভাবে ফেলে রাখা চকলেট আর টফি জাতীয় খাদ্যসামগ্রির তাকে। একটা চকলেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে দেখি মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে জুন মাসে। মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার এরকম প্রকাশ্যে দোকানে বিক্রি করার শাস্তি অনেক হাজার ডলার জরিমানা সহ দোকানের লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি। এরা কি জানে না এসব, নাকি পরোয়া করে না? একটা দুটো নয় তাকের প্রায় অর্ধেক জুড়ে সাজানো রয়েছে এই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া চকলেট বার। দোকানে যে খুব একটা বিক্রি টিক্রি হয় না তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু এদেরকে জানানো উচিত যে তাদের চকলেটের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে মেয়েটার সামনে যেতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো। খাঁটি চায়নিজ ভাষায় চিৎকার। প্রায় সাথে সাথেই দোকানের ভেতর দিক থেকেও মহিলাকণ্ঠের পাল্‌টা চিৎকার ভেসে এলো। আমার মনে হলো চায়নিজ ভাষার যে উপভাষায় এরা বাক্যবিনিময় করছে তা খুব একটা শ্রুতিমধুর নয়। মহিলা বেরিয়ে এসেছেন ভেতর থেকে। গলায় জড়ানো কিচেন এপ্রোন আর কোমরে একটা সাত আটমাসের বাচ্চা। বাচ্চাটার সর্দি লেগেছে আর তা অনেক ঘনত্ব নিয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এপ্রোনটার ময়লা দেখে মনে হচ্ছে গত কয়েকবছর ধরে এটার গায়ে পানি বা ডিটারজেন্ট কিছুই

লাগেনি, কেবল ময়লাই লেগেছে। মহিলার পিছু পিছু বছর চারেকের আরো একটা মেয়ে এসে দাঁড়ালো দোকানের কাউন্টারের কাছে তার মায়ের গা ঘেঁষে। মহিলার এই তিনটে ছেলেমেয়ে নাকি আরো আছে? বয়স দেখে মনে হচ্ছে আরো বড় ছেলেমেয়ে থাকলেও থাকতে পারে। চীনাদের চীনদেশ ছেড়ে চলে আসার একটা প্রধান কারণ নাকি সেদেশের ওয়ান চাইলড পলিসি। আমি কিছু বলার আগেই মহিলা বললেন,

- 'তু দলার।'

আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে তার দোকানের এই চকলেটের মেয়াদ শেষ এবং তা বিক্রি করলে কী কী সমস্যায় তারা পড়তে পারে। মহিলা তার ছোট ছোট চোখ দুটোকে যথাসম্ভব বড় করে শুনলো আমার কথা। তারপর বললো,

- 'ওয়ান পিচ, তু দলার।' এবার সাথে আঙুলের মুদ্রায় দেখালো দুই। এদেশে আঙুল দেখানোর কিছু কায়দা আছে যা একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই হয়ে পড়ে বড় বেশি অশ্লীল অর্থবোধক। এই মহিলার ইংরেজি জ্ঞান আসলেই খুব সীমিত নাকি ইচ্ছা করেই দায়িত্ব এড়ানোর জন্য এরকম ভান করছে। আমি কি একটা ঝামেলা তৈরি করবো, নাকি আমার কিছু যায় আসে না ভাব করে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবো। মনে হচ্ছে চকলেটের মেয়াদ ইত্যাদি নিয়ে মহিলা খুব একটা বিচলিত নন। তার মুখ 'তু দলার' বললেও বলার ভঙ্গি বলছে, 'নিলে নে, না নিলে ফুট্'। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো আমার। কোন রকমে সামলে নিয়ে চকলেটটা কাউন্টারে রেখে বেরিয়ে এলাম।

আরো দোকান আছে আশে পাশে। একটা পার্ক দেখা যাচ্ছে। আমাকে খুঁজে বের করতে হবে লোফ্‌টাস স্ট্রিট। পার্কের সামনের রাস্তায় একটা গ্রোসারি শপ দেখা যাচ্ছে। দোকানে ঢুকে ভালোই লাগলো। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর গোছানো। চকলেটগুলোও বেশ টাটকা নতুন। আর দোকানের দেখতে ইন্ডিয়ান ছেলেটাও বেশ চটপটে। লোফ্‌টাস স্ট্রিটের নির্দেশনা এমন ভাবে দিলো যেন সে নিজের বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছে আমাকে। রাস্তায় বেরিয়ে তার কথা মতো লোফ্‌টাস স্ট্রিট খুঁজে পেতে কোন সমস্যা হলো না। একটু হেঁটে বাড়িটাও পেয়ে গেলাম।

মেইন গেট বন্ধ। গেটের দেয়ালে ইউনিট নাম্বার লেখা সারি সারি ডোরবেল। নির্দিষ্ট নাম্বারে বেল টিপতেই বেলের সাথে লাগানো স্পিকারে ভেসে এলো বৌদির মিষ্টি গলা, 'হু ইজ দেয়ার?' নাম বলতেই আরো মিষ্টি শব্দ ভেসে এলো, 'দরজা খুলে দিচ্ছি, ভেতরে চলে আসুন।' খুট করে একটা শব্দ হলো আর দেখা গেলো লোহার গেট ফাঁক হয়ে গেলো একটু। আরব্য রজনীর সিসেম ফাঁকের বাস্তব রূপ। ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ ওঠার পরেই দেখছি হন্তদন্ত হয়ে নামছেন একজন। নির্মলদা। মুহূর্তেই আমাকে বুকে টেনে নিলেন আক্ষরিক আর প্রায়োগিক উভয় অর্থেই। ফ্ল্যাটের দরজার মুখে ভাতের থালা হাতে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বৌদি। ভাতের থালা হাতে দেখে হঠাৎ একটু থমকে গিয়েছি। ফুল চন্দন বা দই দিয়ে অতিথিকে বরণ করে শুনেছি। কিন্তু ভাত সবচেয়ে বেশি দরকারি হলেও এরকম ভাত দিয়ে বরণ করার প্রচলন কোথাও আছে বলে শুনিনি কখনো। একটু পরেই বুঝতে পারলাম সে রকম কিছু নয়। বৌদির পেছনে লুকিয়ে আছে পাঁচ ছয় বছরের ফুটফুটে এক মেয়ে। বৌদি তাকেই খাওয়াচ্ছিলেন।

ঘরে ঢুকলেই মন শান্তিতে ভরে যায় এরকম চমৎকার সাজানো গোছানো এপার্টমেন্ট নির্মলদা আর কাজল বৌদির। ফুটফুটে দুই মেয়ে; ক্লাস ফাইভের তিথন আর নার্সারি ক্লাসের পুষ্পা। মানুষকে আপন করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা এবাড়ির প্রত্যেক মানুষের। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মনে হচ্ছে আমি যেন এবাড়িরই কেউ, পড়াশুনা করতে মেলবোর্নে গিয়েছি, এখন ছুটিতে বাড়িতে এসেছি। মনেই হচ্ছে না যে আমার সাথে এঁদের দেখা এই প্রথম। পুষ্পা আর তিথন আমার নামও শোনেনি আজকের আগে, কিন্তু আমার সাথে তাদের জড়তাহীন আন্তরিক আচরণ দেখে মনে হচ্ছে আমি তাদের সত্যিকারের কাকু। বাংলাদেশে রেখে আসা আমার দাদার দিদির ছেলেমেয়েদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এরা। আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, আমার চোখে পানি চলে আসছে।

নির্মলদা নাকি টেনশান করছিলেন আমার জন্য। কারণ আমি প্রায় একঘন্টা আগে টেলিফোন করেছি। স্টেশান থেকে আসতে তো এত সময় লাগার কথা নয়। আমি যে সিডনি থেকে টেলিফোন করেছি তা তাঁদের মাথায় আসেনি আর আমিও তো বলে দিইনি যে সিডনি থেকে করছি। নির্মলদা গাড়ি নিয়ে বেশ কয়েকবার খুঁজে এসেছেন আমাকে স্টেশান অবধি। তাঁদেরকে অসুবিধায় ফেলার জন্য আমার ভেতরের লজ্জার ভাবটা চলে আসছিলো, কিন্তু তা কেটে গেলো পুষ্পার দাপাদাপিতে। তিথন আমাকে নিয়ে গেলো তার ঘরে। ছোট্ট ছিমছাম ঘর, একটা মনোরম স্নিগ্ধতা ঘিরে আছে চারপাশে। এই স্নিগ্ধতার নাম ভালোবাসা। চকলেট হাতে নিয়ে এমন মিষ্টি করে হাসলো মেয়েরা, মনে হলো চাঁদ হাতে পেয়েছে। এরকম অনেক অনেক প্যাকেট চকলেট তাদের ঘরে আছে, এরচেয়ে অনেক অনেক ভালো চকলেট তারা খায়; কিন্তু আদর করে কেউ অতি সামান্য কিছু দিলেও তা নিয়ে এরকম খুশি হবার অসামান্য ক্ষমতা তারা কোথায় পেলো!

স্নান করার পর হাজার কিলোমিটার ভ্রমণের ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো। ইলিশমাছ, শাক, ডাল, মাংস, আচার; এমন দারুণ রান্না আর দারুণ খাবার দীর্ঘ দেড়বছর খাইনি। আমার খাওয়া দেখে আমি নিজেই বুঝতে পারছি খাওয়াটা 'গোগ্রাসে খাওয়া'র পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এরকম খাবার সামনে পেয়ে সীমা মেনে চলার মতো বেকুব আমি হতে পারবো না কোন কালেই। কাজল বৌদি পাতে তুলে দিচ্ছেন এটা ওটা, নির্মলদাও সমানে এটা দাও, ওটা দাও বলে তাল দিচ্ছেন। মানুষ এরকম আন্তরিক হতে পারে কোন অচেনা মানুষের প্রতি! বিদেশে যারা থাকেন সবাই কি এরকম আন্তরিক, নাকি যারা আন্তরিক তারা সব খানেই আন্তরিক।

আমাকে বিশ্রাম করার সুযোগ দিয়ে নির্মলদা মেয়েদের নিয়ে লাইব্রেরিতে গেলেন। আমি তিথনের ঘরে শুয়ে পড়লাম। তিথন লাইব্রেরিতে যাবার আগে তার ক্যাসেট প্লেয়ারে মান্না দে'র গান চালিয়ে দিয়ে গেছে। আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে কেউ ডেকে ডেকে বলছে, 'তুমি কি সেই আগের মতোই আছো, নাকি অনেক খানি বদলে গেছো?' আমারো খুব জানতে ইচ্ছে করে।

বেশ একটা দিবানিদ্রা দিয়ে উঠে দেখি পুষ্পা একটা কাঁচি হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমার মাথার কাছে। ঘুমের মধ্যে চুল কেটে নিয়েছে নাকি আমার? না সেরকম দুষ্টুমি করতে এরা শেখেনি।

সে শুধু জানতে চাচ্ছে তার অতি প্রয়োজনীয় কিছু কাটাকুটিতে আমি তাকে সাহায্য করতে পারি কিনা, আর আমি তার মতো শক্তহাতে কাঁচি ধরতে জানি কিনা। যথাসম্ভব সিরিয়াস ভঙ্গিতেই পুস্পার কাগজ কাটায় সাহায্য করতে লাগলাম এবং আমি যে এই কাজে মোটেও কোন কাজের না তা বারবার শুনতে লাগলাম। তিথন এসে বসলে তার সাথে গল্প করলাম কিছুক্ষণ। তাদের স্কুলের গল্প, সে কী কী পছন্দ করে, কেন করে ইত্যাদি। সারাক্ষণ পড়াশুনা তার ভালো লাগেনা। খুব বেশি হৈ চৈ করতেও তার ভালো লাগেনা। নিউইয়ার্সে এশফিল্ডে বাজী পোড়ানো হয়। সিডনির বিখ্যাত ফায়ার ওয়ার্ক্স দেখা হয়নি তার এখনো। এপর্যন্ত দেখা জায়গাগুলোর মধ্যে তার সবচেয়ে ভালো লেগেছে উলংগং।

- 'সমুদ্রের কাছে ছোট একটা ছবির মতো জায়গা উলংগং। সুযোগ পেলে যেয়ো। তোমারও ভালো লাগবে।'

বললাম, যাবো। ভালো লাগলো তিথনের নিজের মতো করে চিন্তা করার ক্ষমতা দেখে আর তা গুছিয়ে বলতে পারার ক্ষমতা দেখে। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারাতো সহজ কথা নয়। তার বইয়ের কালেকশান দেখে বুঝতে পারছি জ্ঞানের প্রতি আগ্রহটা খুব পরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করা হচ্ছে তাদের জন্য। ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারলাম নির্মলদার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর।

নির্মলদা বাংলাদেশে থাকতে মৎস্য বিভাগে কাজ করতেন। অফিসার আর গবেষক হিসেবে ছিলেন দারুণ সফল। অস্ট্রেলিয়ায় ইমিগ্রেশানের জন্য দরখাস্ত করার সাথে সাথেই তা পেয়ে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় আসার পর বছর খানেক কাজ করেছেন কম্বোডিয়ায়। সেখান থেকে ফিরে আপাতত কিছুদিন পড়াশোনা করছেন বিভিন্ন বিষয়ে। এই মানুষটার জানার পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত। আমি যতই শুনছি তাঁর কথা ততোই মুগ্ধ হচ্ছি। মনে হচ্ছিলো নির্মলদা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালে ছাত্রছাত্রীদের দারুণ উপকার হতো। বিকেলের চা খাবার পর নির্মলদা বেরোলেন একটা নতুন আসা বাঙালি পরিবারকে নিয়ে আসতে। আমি কাজল বৌদির সাথে গল্প করতে লাগলাম। কাজল বৌদি এখন একটা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। জানা গেলো এই এশফিলডে আরো অনেক কৃতি বাঙালি থাকেন। কবি সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত থাকেন এই স্ট্রিটেই। এখন অবশ্য বাংলাদেশে বেড়াতে গেছেন। বিখ্যাত বিতার্কিক আর রম্যলেখক বিরূপাক্ষ পাল থাকেন এখানে। সাপ্তাহিক সময়-এ বিরূপাক্ষ পালের কলাম আমি গোগ্রাসে গিলতাম। বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছে অনেক মহৎ প্রতিভার মানুষ। কিন্তু বাংলাদেশ তাঁদের ধরে রাখতে পারছেনা নিজের মাটিতে। মায়ের কাছ থেকে দূরে গেলেও সন্তান মায়েরই থাকে চিরদিন। আমাদের দেশের কৃতি সন্তানরাও যেখানেই যান, চিরদিন আমাদের দেশেরই থাকবেন। আমরা বাঙালি হিসেবে তাঁদের নিয়ে গৌরব করবো।

নতুন আসা পরিবারের সদস্য সংখ্যাও চার। তিথন আর পুস্পার মতোই ফুটফুটে দুটি মেয়ে তাঁদের। আড্ডা জমে গেলো। আবার চা চপ চললো। নতুন দাদাটি বাংলাদেশ থেকে প্রথমে নিউজিলান্ডে মাইগ্রেট করেছিলেন। সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন কিছুদিন হলো। নির্মলদা নিঃস্বার্থ পরোপকারী। নতুন এলে কী কী সমস্যা হয়ে থাকে তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন আর তার ব্যবহারিক সমাধানও দিচ্ছেন। আমার মুগ্ধতা বাড়ছে তো বাড়ছেই।

কোন্ দোকানের চাল ভালো থেকে শুরু করে সর্দির জন্য কোন্ অষুধ বেশি কাজ দেয় সব নির্মলদার ভালো ভাবে জানা। বৌদি দুজন রান্নাবান্না আর গৃহস্থালি নিয়ে কথা বলছেন। বাচ্চারা খেলছে ভেতরে তাদের ঘরে।

নির্মলদা আর নতুন আসা দাদা বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি। ভাবছি আমার দেশ এরকম দুজন কৃতি কর্মী পুরুষকে হারালো। বাংলাদেশের যে কোন ভবিষ্যত নেই, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের বেশির ভাগই যে ভন্ড তা বলছেন নির্মলদারা। তাতো আমাদের মতো সাধারণ মানুষও জানে। কিন্তু আমাদের হাতে তো কিছু করতে পারার ক্ষমতা নেই। নির্মলদাদের মতো যারা বিদগ্ধ চিন্তা করতে পারেন তাঁদের সবাইকে তো কেড়ে নিচ্ছে আমেরিকা কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া। এদেশে যারা প্রবাসী তাঁরা সবাই কি এভাবে নিজেদের ফেলে আসা দেশের কথা ভাবেন? আমি দেশ থেকে এসেছি বেশিদিন হয়নি বলেই হয়তো দেশের নিন্দা খুব একটা ভালো লাগছিলো না। কিন্তু নির্মলদার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি যখন বলছেন আমাদের দেশের কথা তখন তা বিশ্বাস না করার মতো সাহসও আমার নেই। আমার নিজের জানার পরিধি এত কম বলেই হয়তো আমি কেন যেন এখনো স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশ একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবে।

স্বপনদারা এলেন নটার দিকে। স্বপনদা আর নীলিমাবৌদি ঘরে ঢুকতেই তিথন আর পুষ্পা হৈ হৈ করে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁদের ওপর। একটু পরেই পুষ্পাকে দেখা গেলো স্বপনদার কোলে। স্বপনদা আর নীলিমাবৌদিকে যে এরা দারুণ ভালোবাসে তা কাউকে বলে দিতে হবে না। স্বপনদার সাথে দেখা হলো অনেক বছর পর। নীলিমাবৌদির সাথে আমার একবার মাত্র দেখা হয়েছে এর আগে; তাঁদের বিয়ের পর পর আমার দিদির বাসায়। স্বপনদাও নির্মলদার মতোই বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। হৃদয়ে এত উষ্ণতা এঁরা কোত্থেকে পেয়েছেন আমি জানিনা। নির্মলদা স্বপনদার ভাই। হৃদয় তাদের সমান বিশাল। আমার কোন কষ্ট হয়েছে কিনা তা জানার জন্য স্বপনদা আর নীলিমাবৌদি সমান ব্যস্ত। আমার মত মানুষের জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা দেখে লজ্জা পাচ্ছি আমি। আমার জন্য স্বপনদারা তাঁদের ভ্রমণ সংক্ষেপ করে চলে এসেছেন।

রাতের খাবার দেয়া হলো টেবিলে। খাবার আর প্লেট সাজিয়ে রাখা আছে। যে যার ইচ্ছে মতো খাবার তুলে নিয়ে বসে খাওয়া। ব্যবস্থাটা খুব ভালো লাগলো আমার। খেতে খেতে গল্প করছেন স্বপনদা, নির্মলদা, নীলিমা বৌদি। স্বপনদা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন মেলবোর্নের খবর, বাংলাদেশের খবর। কাজলবৌদি আবার বলে ফেললেন যে আমি গত দেড়বছরে আজকেই প্রথম কোন বাঙালি পরিবারে বাঙালি খাবার খেলাম। স্বপনদা তাঁর স্বাভাবিক রসিকতায় বলে উঠলেন,

- 'কী বলো! তুমি তো বোকা। মেলবোর্নে বাঙালি নেই! তাদের মেয়ে টেয়ে নেই! তাদের বাসায় যাবে, একটু লোভ টোভ দেখাবে। দেখবে নিমন্ত্রণ খেয়ে শেষ করতে পারবে না।'

লজ্জা পাওয়ার বয়স সম্ভবত আমি পেরিয়ে এসেছি। তাই এই রসিকতায় অন্যদের সাথে আমিও হাসলাম আকর্ণ বিস্তৃত করে।

সময়কে আমরা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই ঠিকই, কিন্তু সময় পেলেই আমরা ফিরে ফিরে দেখি পেছনের দিকে। দেখি বলেই স্বপনদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন,
- 'বনানী পাল কেমন আছে?'
নীলিমাবৌদির কান এড়ায় না কথা। তিনি হাসতে হাসতে ক্ষেপাচ্ছেন স্বপনদাকে,
-'কার কথা জিজ্ঞাসা করছো?'
স্বপনদাও বেশ মজা করে বলছেন,
- 'জানো তো, বনানীকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম তখন প্রদীপ সাথে ছিলো।'
তারপর বনানীর প্রসঙ্গ এলো। বনানী আমাদের বন্ধু। ইউনিভার্সিটিতে আমরা একই ব্যাচের। স্বপনদা বিয়ের আগে একবার আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এলে আমরা মজা করে বনানীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। বনানী কিছু জানতো না। স্বপনদা বনানীর সাথে তেমন কিছু কথাও বলেননি। আমরা আমাদের আরো অনেক বন্ধু সহ ইউনিভার্সিটির ঝুপড়ি দোকানে বসে চা খেয়েছিলাম। বনানী যে তখন প্রেম করছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়র ছেলের সাথে তা আমরা জানতামও না। পরে জেনেছি। স্বপনদা বনানীর কথা বলে নীলিমা বৌদির সাথে মজা করছেন এখন। আমার বেশ মজাই লাগছিলো তাঁদের এই খুনসুটি।

নির্মলদা কিছুতেই ছাড়তে চাচ্ছিলেন না আমাকে। পুস্পাটাতো পারলে হাত ধরে টেনে রেখে দেয়। এত মায়া এরা কোত্থেকে পায়! কোন রকমে বিদায় নিয়ে উঠে বসলাম স্বপনদার লাল টুকটুকে টয়োটায়।

স্বপনদার বাসা ওয়েস্টমিডে। প্যারামাটা সাবার্বে। ওয়েস্টমিড রেলস্টেশানের সামনেই স্বপনদা আর নীলিমাবৌদির ইউনিট। নিজেদের এপার্টমেন্ট। দুজন মানুষের জন্য বিশাল বড় এই ফ্ল্যাট। বিশাল ডাইনিংরুম, লাউঞ্জ রুম। স্টাডি রুমে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। চারপাশে বই আর বই। বাংলা গানের ক্যাসেটের বিরাট সংগ্রহ। দুটো ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফ্যাক্সমেশিন, প্রিন্টার; একজন আধুনিক কর্মী মানুষের যা যা লাগে সব কিছু হাতের কাছে। ঘরের মাঝখানে ধপধপে তুলতুলে বিছানা। এঘরে আমি থাকবো জেনে মনে হচ্ছে আমার হাতে কেউ পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটা অংশ তুলে দিয়েছে। লাউঞ্জরুমের পুরু কার্পেটে পা ফেলে হাঁটতে একটু অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার পায়ের ময়লা লেগে যাবে এই ধবধবে কার্পেটে। লাউঞ্জরুমে বিশাল একটা টেলিভিশন। সাথে ভি-সি-আর আর ক্যাবল সংযোগ। একপাশের দেয়ালের তাকে সাজানো আছে তাঁদের মেধা আর যোগ্যতার স্মারক গোল্ড মেডেল,ট্রফি ইত্যাদি।

স্বপনদা মানে ডক্টর স্বপন পাল। প্যারামাটা সেন্টেনিয়াল পার্কের সায়েন্টিফিক অফিসার। ইউনিভার্সিটি জীবনের সব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পাওয়া মানুষ স্বপনদা। দারুণ বিতার্কিক। জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কে শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছেন অনেকবার। নীলিমাবৌদি এখানে দুটো ইউনিভার্সিটির খন্ডকালীন শিক্ষক। তাঁর একাডেমিক ক্যারিয়ার দেখলে অবাক হতে হয়। এই মানুষটা কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড থেকে বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ইউনিভার্সিটি জীবনের সব পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। এম-ফিল পরীক্ষায় এত ভালো করেছেন যে তাঁর এম-ফিলকে পি-এইচ-ডি তে উন্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে এত দূরে থেকেও

এঁরা যে বাংলাদেশকে কত ভালোবাসেন তা যদি সবাই জানতো। ঘরের যেদিকে তাকাই সেদিকেই বাংলাদেশের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের মানচিত্র, পতাকা, বাংলাদেশের নকশিকাঁথা, বাংলাদেশের মাটির পুতুল আর হৃদয় জুড়ে বাংলাদেশের মানুষ।